অচিন পিসে

শ্রীকুমার চক্রবর্তী

বয়সটা পঁয়ত্রিশ পেরোতে-না-পেরোতেই গ্রামান্তরে যেতে হল অচিন পিসেকে। 'পিসেমহাশয়' শব্দটি ছোটো হতে হতে 'পিসে' হয়ে সেঁটে গেছে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার মনে। যাওয়ার আগে মোটামুটি খোঁজখবর নিয়ে স্ত্রীর বাপেরবাড়ির গ্রামে যাওয়াটাই তার কাছে শ্রেয়। গ্রামান্তরে 'সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ যে মাটি সোনার বাড়া' — ছেড়ে কেন যেতে হবে তা নিয়ে নানাজনের নানা মত রয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে সবাই একমত যে অচিন পিসে পরিশ্রম করতে পারে না। পরের জমিতে কাজ করে যে সমস্ত পরিবারের উনুনে হাঁড়ি চাপে সেইসব পরিবার একজন নিখাটু বা কম পরিশ্রমী হলে পরিবারের অন্য সদস্যদের চোখ কপালে ওঠে। পরিস্থিতি খুবই তিক্ততার মধ্যে চলে যায় — নিখাটু মানুষটির বিয়ের পর পর। তখন একে পরান্নভোজী সঙ্গে তিন চেলা — বাক্যের বন্ধনীর মধ্যে চলে যায়। শুরু হয়ে যায় ...

অচিন পিসে গ্রামান্তরে যাওয়ার পর উদ্‌বাস্তু খাতাটায় নাম লেখানোর চেষ্টা করেও পেরে উঠল না। মাসে ছশো টাকা নগদ ভাতা পাওয়া যাবে। জমি পাওয়া যাবে বাড়ি তৈরির জন্য, পাট্টা জমি পাওয়া যাবে চাষের জন্য, সস্তায় চাল গম পাওয়া যাবে, বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়া যাবে, পুজোর সময় জামাকাপড় পাওয়া যাবে — এ সবই পিসেকে টেনেছিল। কারণ সে শুনেছিল দেশ ছাড়া হলে উদ্‌বাস্তু বলে গণ্য হয় এবং উদ্‌বাস্তু হলেই সুযোগসুবিধেগুলো পাওয়া যায়। শুধু শোনা কেন, সন্ধেবেলা বাড়ির ছেলেদের পড়ার সময় সে নিজে শুনেছে, 'বাস্তু হইতে যে উৎখাত হয় তাকে উদ্‌বাস্তু বলে'। এরা স্ত্রী, সন্তানসহ চলে এসে স্কুলবাড়ি বা কমিউনিটি হলে স্থান পায়। দু-বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা, অন্তত একবার জলখাবারের ব্যবস্থা, বাচ্চাদের দুধের ব্যবস্থা, মাঝে মাঝে ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা — সবই বিডিও সাহেব করে দেন। কোনো কাজ না-করেই দু-বেলা খেতে পাওয়া, পাকা বাড়িতে থাকা — নিখাটু লোকেদের পক্ষে খুবই সুখের। বেশ কিছুদিন থাকার পরেও যখন নিজের বাড়িতে ফিরে যায় না তখনই টান দেওয়া হয় খাওয়ার বরাদ্দে। অনেকের বাড়ির দিকে ফেরার মনোভাবটাই নষ্ট হয়ে যায়। কারও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে অনুরোধ এসেছে অথবা পরিকল্পনা ভেঁজে কোথাও গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে থেকে রোজগারের মাধ্যমে সব পুষিয়ে নিতে পারবে আত্মবিশ্বাসে ভর করে তখন আর বাড়ির দিকে পা বাড়ায় না। অবশ্য এই শ্রেণির মধ্যে ভূমিহীনরা যার বাস্তুজমিটুকু সম্বল অথবা যৌথ পরিবারে সদস্যসংখ্যা বেশি তারাই এরকম কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে, ঝুঁকি নিয়ে — ভিন দেশে, ভিন গাঁয়ে পা বাড়ান। জীবন চলে উলটোমুখে।

উদ্‌বাস্তুদের দেখাশোনার জন্য উদ্‌বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর বলে একটি সরকারি দপ্তর ও রয়েছে। তাদের সব জেলায় আধিকারিক রয়েছে। তারা সব নজরদারি করে। অচিন পিসে দেখেছে নন্দীগ্রাম বা সিঙ্গুর বা যেকোনো জায়গায় মানুষ যখন গ্রামছাড়া হয়েছে তখন তাকে সবাই 'ঘরছাড়া'

বলছে। কেউ উদ্‌বাস্তু বলছে না। এইসব ঘরছাড়াদের কিন্তু ত্রাণের জিনিসপত্র অর্থাৎ ত্রিপল, গম, চাল, ওষুধ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু উদ্‌বাস্তু বলে গণ্য হচ্ছে না। ওদেরকে চিহ্নিত করতে নতুন শব্দ 'ঘরছাড়া' ব্যবহৃত হচ্ছে। এরা স্থায়ীভাবে থাকবে না অথবা এই রাজ্যের মধ্যে, জেলার মধ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বসবাসের জন্য তাই উদ্‌বাস্তু শব্দটা ব্যবহৃত হচ্ছে না। ধোঁয়াশাটা ধোঁয়াশা — কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না। অচিন পিসের মনে পড়ে, তার যৌবনে একদিন বাড়ি চুরি করতে এসে চোরটা ধরা পড়ে গিয়েছিল। গণপ্রহারের ধাক্কা দেওয়ার সময় সবাই বলছিল 'মেরে দেশ ছাড়া করে দেবো'। অচিন পিসে সেই থেকে জেনেছে, গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেলেই দেশ ছাড়া হয়। অন্য রাষ্ট্রে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

এই বয়সের মধ্যে সে অনেককে দেখেছে, ইচ্ছে করে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে — বিশেষ করে জোতদারগুলো। পয়সাওয়ালারা তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য বা ভালো চিকিৎসার সুযোগসুবিধের জন্য শহরের আধুনিক জীবনযাত্রাকে উপভোগ করবার হাতছানিতে সাড়া দিয়ে প্রথমে চুপি চুপি মাসে একবার এসে গ্রামের জমিগুলো বিক্রি করতে শুরু করে। শেষের দিকে যখন পুকুরগুলোর অংশ, বাস্তুজমির হিস্যাটা আর কাটা-ছেঁড়ায় পরিষ্কার হয় না তখন সেটুকুর আশা ছেড়ে দিয়েই ভোটার তালিকায় নাম সংশোধনের জন্য বিডিও অফিসে দরখাস্ত জমা দেয়। কথা বলার মতন লোকজন পাওয়া যাচ্ছে না, পৈত্রিক বাড়িটা ভেঙে গিয়েছে মেরামতের পয়সা কোথায় পাব — এইসব অজুহাতগুলো একটু প্রচারে দিয়ে সহানুভূতির শেষ তলানিটুকুকে সঙ্গে নিয়ে পা তুলে নেয়। বেশিরভাগ লোকের গন্তব্যস্থল কলকাতা। একসময় যেভাবে মানুষকে দাবিয়ে রেখেছে, ফরমাইস করেছে, বিনা পারিশ্রমিকে বা কম মজুরিতে খাটিয়ে নিয়েছে তা আর সম্ভব হচ্ছে না, অথচ মেজাজটা থেকে গিয়েছে। 'রক্তে আমার জমিদারি' — এরকম দম্ভোক্তিও মাঝেমধ্যে করেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সকলে এগোনোর ফলে ফরমাইস খাটার লোক পাওয়া যায় না।

সকাল থেকে বাড়ির বারান্দায় কোনো মানুষ অযাচিতভাবে তোষামোদের শ্রুতিমধুর বাক্য শোনাতে আসে না। তাই লক্ষ জনতার ভিড়ে কলকাতায় হারিয়ে যাওয়াটাকেই শ্রেয় মনে করে। সেখানে পূর্ব পরিচয়ের প্রশস্তি নেই বা বসবার ঘরে উপভোক্তা চাটুকারদের দীর্ঘ লাইন নেই। এ ঠাঁই বড়ো কঠিন ঠাঁই। আপন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল হতে হবে। নান্যপন্থা। তাই গ্রামের বসতের সংখ্যা কমতির দিকে।

কিন্তু অচিন পিসের গ্রামছাড়া হওয়ার মধ্যে এগুলির কোনোটাই ছিল না। বছর-বিয়োনো তার স্ত্রী ইতোমধ্যে তিনটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়ায় পরিবারের সদস্যসংখ্যা পাঁচ হয়ে গিয়েছে। দাদারা প্রকাশ্যে, বউদিরা আড়ালে কথায় কথায় — 'খাটবার মুরোদ নেই; খাওয়ার লোক বেশি' বলে খোঁটা দিচ্ছে। তিন ছেলের হাত ধরে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন তাই শ্বশুরবাড়িতে হাজির হয়।

জামাইয়ের অবস্থাটা অনেক আগেই আঁচ করতে পেরেছিল শ্বশুরবাড়ির লোকজন। উঠোনের কাঁটা গাছ ওপড়ানোর মতো এবং আত্মজকে প্রতিষ্ঠিত করানোর উপলব্ধির কনামাত্র হৃদয়ে না-

রেখে মেয়েটাকে একটা ছেলের হাতে বিবাহসূত্রে তুলে দিয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই পরপর সন্তান হওয়ায় নিখাটু জামাইয়ের পারিবারিক অশান্তির আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে তা টের পেয়েছিল। তাই চমকানোর মতো ঘটনা নয়। শ্বশুরবাড়িতে দুই শ্যালক একসঙ্গে থাকে। তাদের ছেলেমেয়ে, বুড়ি মা, একেবারে রাবণের গুষ্টি। ঘুমোনোর জায়গা পর্যন্ত হয় না। খোলা উঠোনে অনেকদিন শুয়ে রাত কাটাতে হয়।

দুপুরের খাওয়ার পর বিকেলেই গ্রামের বামুনের বাড়িতে অচিনকে নিয়ে হাজির হয় দুই শ্যালক। আপনাদের খালি বাড়িটায় একটু থাকবার অনুমতি দিন। আপনি বামুন মানুষ, নিজে লাঙল করতে পারেন না। আপনার যে সামান্য জমি জিরেত আছে তাতে ও চাষের কাজ করে যাবে। আমরা সবসময় আপনার সব কাজ করে দেব। বামুনবাড়ির সব সময়ের অনুগত ছিলেন এই দুই ভাইয়ের বাবা। সম্প্রতি সাপের কামড়ে সে মারা গিয়েছে। সহানুভূতি সবটুকু এখনও নিঃশেষ হয়নি। অকৃতজ্ঞ হওয়ার বদনাম বামুন পরিবারের নেই। রাজি হয়ে যায়। অচিন পিসে আস্তানা গাড়ে পোড়ো বাড়িতে।

মোটামুটি সাড়ে চার ফুট লম্বা একটু কুঁজো মানুষ, চলার সময় পায়ে হাড়ের খট খট শব্দ হয়। পা টিপে টিপে যাওয়ায় অপারগ, একটু নাচের ভঙ্গিতে বাধ্য হয়ে চলাফেরা করে — অল্পদিনেই বামুন পরিবারের বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। পরিশ্রম করতে পারে না ঠিকই কিন্তু সকাল থেকে সন্ধে লেগে থাকার ব্যাপারটাতে দড়। বহুদিন দুপুরে খাওয়ার সময় বামুনদের বাড়িতে পাতা পেড়ে বসে যাওয়ার ডাক আসে। একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসে নিজের পেতে নেওয়া কলাপাতাতেই বসিয়ে খাওয়ায়। ঠাকুরের পুজো আচ্চা হলে তো কথাই নেই। তিনটে ছেলেকেই সঙ্গে নিয়ে চলে আসে। স্ত্রীর খাওয়ার জন্য কখনোই ভাবে না। ওর বিশ্বাস, মেয়েমানুষের জান, বিড়ালের প্রাণ — কম খেলে কিছু হবে না। ধান থেকে চাল হয়ে যাওয়ার পরে পড়ে থাকা চালের ভাঙা অংশগুলো সেদ্ধ করে বা আগের দিনের উদ্‌বৃত্ত জলে রেখে দেওয়া ভাত দিয়েই খিদেটা মেটায়।

বামুনের জমিতে কাজের সূত্রে আলাপ হয়ে যায় খেতমজুর অকিঞ্চনের সঙ্গে। আলাপের ঘনিষ্ঠতা বাড়তেই অচিন পিসে তাকে বাড়িতে ডাকে। স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। সেই থেকে অকিঞ্চন নিত্য-অতিথি হয়ে যায়। সারাদিন সামান্য যা টুকটাক কাজ অচিনের জন্য বামুন বরাদ্দ করে — তার অনেকটাই অকিঞ্চন টেনে নিয়ে করে দেয়। পরিশ্রমী যুবক। তাই তার বরাদ্দ কাজ ছাড়াও অচিনের কাজ করতে অসুবিধে হয় না। দুপুরে অচিন সামান্য কিছু জোটে তো খায়, নাহলে বিশ্রামের জন্য চিলেকোঠায় চলে যায়। অকিঞ্চন নিজের খাটুনির রোজগার থেকে মাঝে মাঝে চাল, নিজের জমির শাক-সবজি, উৎসবের সময় অচিনের স্ত্রীকে শাড়ি দিয়ে দেহের বায়না দেওয়ার পর্বটা এগিয়ে রাখে।

অচিন পিসে পাঁচটা পেটের খাওয়া-পরার ব্যাপারটা এখন অনায়াসে হয়ে যাচ্ছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়। কী হল, কেমন করে হল — এসব আমজনতার প্রশ্নগুলো তাকে নাড়া দেয় না।

বামুনদের কাজ শেষ হয়ে যায়। অকিঞ্চন নিজের বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পথ হেঁটে অচিন পিসের বাড়িতে প্রতিদিন আসে। বাড়তি রোজগারের জন্য অচিনের স্ত্রী মুড়ি ভাজে।

উনুনে মুড়ি ভাজার সময় অকিঞ্চন গা ঘেঁষে বসে। সন্ধেতে শাঁখে ফুঁ পড়তে-না-পড়তে অচিন পিসে ক্লান্ত শরীরটা তলিয়ে দেয় চিলেকোঠায় মাদুরে। ঘুমিয়ে থাকার সুযোগে অচিনের স্ত্রী এবং অকিঞ্চন উভয়েই যন্ত্রণা লাঘব করে নেয়।

স্ত্রীর ভাত আসার অপেক্ষায় জেগে বসে থাকা ধৈর্যের বাঁধ ভাঙার আগেই রাত্রি নটা-সাড়ে নটার সময় পা বাড়ায় বাড়ির দিকে। পথের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এক গোছা পাটকাঠি জ্বেলে নেয়। ভেতরের অন্ধকারকে আড়াল দেওয়ার জন্য কখনো-বা জোরে গলা ছেড়ে গান ধরে।

দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার শব্দে জেগে ওঠে। নীচে নেমে যায় অচিন পিসে। পরিপাটি করে সাজানো থালায় খাওয়ার জন্য।